দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 OCT 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান

০৭০

পরলোকগত শিক্ষক ডঃ আবু মাহমুদ স্মরণে

হায়াত হোসেন

গত ১৮ই অক্টোবর সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে জনৈক সৈয়দ তারিক খুব দুঃখ করে লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ ডঃ আবু মাহমুদের মৃত্যুর পর এখনো তাঁকে নিয়ে কোথাও কোন লেখা বা রচনা প্রকাশিত হয়নি। বিগত ২৯শে আগষ্ট ডঃ মাহমুদ ঢাকাতে পরলোকগমন করেন। ডঃ মাহমুদের সাম্যবাদী মতাদর্শের অনুসারী না হলেও পত্রলেখক চিঠির শেষাংশে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "তাঁর মতের সঙ্গে পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর অবদান অস্বীকার করার অর্থ নিজেদেরই প্রতারণা করা। আমরা আত্ম-প্রতারক, আমরা অকৃতজ্ঞ। শিক্ষক-পণ্ডিত ও প্রথা-বিরোধী ব্যক্তিত্ব ডঃ আবু মাহমুদের কর্মের উদ্দেশে অভিবাদন।"

আমার মনেও ঠিক একই অনুভূতি। হয়তো বা আরো অনেকের মনে। মৃত্যুর দেড়মাস পর গত ১৬ অক্টোবর জাতীয় সংসদ অধিবেশনের শুরুতে যেসব শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় তার একেবারে শেষে ডঃ মাহমুদের নামটিও জুড়ে দেয়া হয় যেন খুব অনিচ্ছায় এবং দায়সারাভাবে। অথচ মৃত্যুর পর দেশের প্রায় সকল পত্র-পত্রিকায় সে খবর ছাপা হলেও বেতার বা টেলিভিশনে একটিবার ও নামটি উচ্চারিত হয়নি, শোকবাণী আসেনি রাষ্ট্রীয় কর্ণধার বা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। বড় বিচিত্র এই পৃথিবী আর একেই বোধহয় বলে স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় মূল্যবোধের অবক্ষয়।

ডঃ মাহমুদের ছাত্র বা সহকর্মীদের কাছ থেকেই কিছু লেখা বিশেষ করে তার কাজের মূল্যায়ন বা স্মৃতিচারণ আসা উচিত ছিল। হয়তোবা বন্যার প্রচণ্ডতায় সবাই থমকে গেছে বা সাময়িকভাবে হলেও হারিয়ে ফেলেছে সব অনুভূতি। আর তখন সুদূর চট্টগ্রামে বসে আমার কলমটি নিশপিশ করছিল কিছু লেখার জন্য। কিন্তু লেখা হয়ে উঠেনি নানা কারণে। তাছাড়া ভাবলাম লেখার জন্যে তো অনেকেই আছেন। কিন্তু জনাব সৈয়দ তারিকের এই চিঠির পর দু'টি কথা না লিখেই যেন আর পারছি না। শত হলেও এই মহান শিক্ষাগুরুর যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছি আমি, হৃদয়ের সকল উষ্ণতা দিয়ে তা আজ স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাই। ষাট দশকের সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলোতে যখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এইলোকটির জীবন রক্ষা বা নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমরা কিছু তরুণ, তখন দিনের পর দিন আমি ছিলাম তার নিত্যসঙ্গী। আর সলিমুল্লাহ হল ছেড়ে থাকতাম হলের [illegible]

গোটা দেশ এবং কালাকানুনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছিল না ন্যূনতম স্বায়ত্তশাসন তখন ডঃ আবু মাহমুদ ছিলেন শিক্ষাঙ্গনের অন্যতম প্রতিবাদী কণ্ঠ। আর একারণেই তার উপর এতো নিপীড়ন। আজ শুধু একটি ঘটনার উপরই কিছু লিখতে চাই যা শুধু গোটা জাতির বিবেককেই নাড়া দেয়নি, বহির্বিশ্বেও এর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের কথা। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কক্ষে তিল ধারণের স্থান নেই।

ডঃ আবু মাহমুদ বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক মামলা। ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ অসংখ্য কৌতূহলী লোক কোর্টে ভিড় জমিয়েছে। প্রধান বিবাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ ওসমানগণীও কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চেহারা খুব বিষণ্ণ। তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছেন ডঃ মাহমুদ। একজন বিতর্কিত সহকর্মীকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান এবং তাঁর প্রতি অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কিত একটি মামলায় নিম্ন আদালত ডঃ মাহমুদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন উপাচার্য তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা অমান্য করায় এই মামলা। মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন জনাব হামিদুল হক চৌধুরী আর ডঃ মাহমুদের পক্ষে ছিলেন জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ। বেঞ্চের সভাপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস মোর্শেদ। দু'পক্ষের শুনানির পর মাননীয় আদালত সংক্ষিপ্ত রায়ে উপাচার্য ডঃ ওসমান গণীকে আর্থিক জরিমানা এবং অনাদায়ে কারাভোগের শাস্তি প্রদান করেন। জরিমানার অঙ্কটা এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

মামলার রায়ের সাথে সাথে শুরু হয় জয়োল্লাস। হাইকোর্টের গেট থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় ছাত্রদের মিছিল। গোটা ক্যাম্পাস আনন্দমুখর। কুখ্যাত গভর্নর মোনায়েম খানের দক্ষিণহস্ত হিসেবে উপাচার্য ডঃ গণীর এই শাস্তিতে সবাই যেন দারুণ স্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু এতো আনন্দ-ফুর্তির মাঝে যে একটি মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যাবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে হলে ফিরে প্রায় দুপুর আড়াইটার দিকে যখন আমরা অল্প কয়জন ছাত্র সলিমুল্লাহ হলের ডাইনিং হলে বসে খাচ্ছিলাম ঠিক তখনি দু'জন ছাত্র ছুটে এসে খবর দিল ডঃ মাহ- [illegible]

কক্ষের একটি বড় টেবিলের নীচে বিশাল দেহ নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জনাব হাদী তালুকদার। যদিও তাঁর ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তবুও প্রচণ্ড উত্তেজনার মুখে তিনি ঘাবড়িয়ে যান। বিকেলের দিকে গুণ্ডাদেরকে গভর্নর হাউসে সরিয়ে নেয়া হয় এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ ঢাকার শিক্ষাঙ্গনে যতদিন এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল ততোদিন তারা মহানন্দে স্বয়ং গভর্নর সাহেবের অতিথেয়তা ভোগ করছিল। গভর্নর মোনায়েম খাঁর বড় ছেলে খসরু, যিনি ৬৫ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, ছিলেন এনএস এফ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক। পরে জানা যায় যে, মামলায় জেতার ফলে এনএসএফ-এর গুণ্ডারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই ডঃ মাহমুদকে মারতে এসেছিল। এদের অধিকাংশই ছিল ঢাকা ও ফজলুল হক হলের ছাত্র। আক্রমণের মুখে স্যার নাকি আকুতি করে বলেছিলেন, দেখ বাবারা, তোমরা আমার ছাত্র, তোমাদের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। এই মামলার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এটা আমার আর উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাপার। আমাকে মেরে তোমাদের কি লাভ হবে? কিন্তু এতে নির্দয় পশুগুলো নিরস্ত হয়নি যেহেতু তারা তাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও মুনিব উপাচার্য ডঃ গণীর পক্ষে বদলা নেয়ার স্থির সংকল্প নিয়ে এসেছে উপরিমহলের ইঙ্গিতেই।

ডঃ মাহমুদকে মুমূর্ষু এবং রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। লোহার রড, পেরেকযুক্ত কাঠ ও লাঠি এবং সাইকেলের চেন দিয়ে তার উপর নৃশংসভাবে আক্রমণ চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন অমানবিক ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় হাসপাতাল। বিবিসিসহ বহু বিদেশী গণমাধ্যমে এ খবর প্রচারিত হয়। পরের দিন ঢাকার অনেক পত্রিকায় আহত ডঃ মাহমুদের ছবিসহ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বের হয়। গণধিকৃত গভর্নর, উপাচার্য এবং এন এস এফ-এর এই অপকর্মের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে নিন্দা প্রস্তাব ও বিবৃতি আসতে থাকে। ডঃ মাহমুদ প্রায় তিন সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলেন এবং ঐ সময় শেখ সাহেবসহ প্রায় সব রাজনৈতিক নেতাই তাঁকে দেখতে [illegible]

ছেন। যতটুক জানতাম "হার ফেস" নামের ঐ বাড়ীটি স্যার তার স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছিলেন আর নিজে দুই ছেলেসহ থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির এই দুই ছেলে (এখন বিদেশে) সপ্তাহে একবার মাকে দেখতে যেতো।

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরার পর স্যার ও তার দুই ছেলের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমাকে হল ছেড়ে গিয়ে উঠতে হয় তার বাসায়। পালাক্রমে আমার সাথে অনেকেই ছিল। তবে অধিকাংশ সময় ছিল অর্থনীতির কৃতী ছাত্র মাহবুব উল্লাহ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাহবুবুর রহমান। '৬৪ সালের শেষদিকে মাহবুব উল্লাহকেও একবার প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় এন.এসএফ-এর গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ডঃ মাহমুদ। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই ছাত্রদের মধ্যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা। ইতিহাসের ছাত্র আহমেদ কামাল, সমাজতত্ত্বের কাদের ভুঁইয়া, অর্থনীতির মীর্জা আলমগীর, আজিজ এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এরা তখন নিয়মিত স্যারের বাসায় আসতো এবং প্রয়োজনে রাতযাপন করতো। সরষের তেল, পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে মুড়ি চলতো সারাদিন। ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও অন্যরা আসতেন স্যারের সাথে দেখা বা আলাপ করতে। এক পর্যায়ে গোলযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা ক'জন রয়ে গেলাম স্যারের বাসায়। লাইব্রেরী, বাজার, পার্ক বা যেখানেই তিনি যেতেন তার সাথে আমরা একজন বা দু'জন থাকতাম। আমার এখনো মনে পড়ে ঐ ঘটনার পর এক সময় তিনি এতো ইমোশন্যাল হয়ে পড়েন যে, পর পর বেশ কিছুদিন তিনি আমাদের সাথে লালবাগ জিমনাসিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম ও শরীরচর্চা শুরু করেন আর বলতেন বিপ্লবের প্রয়োজনে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। জ্ঞানাহরণ ছিল স্যারের নেশা। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়তেন। কতো বিষয়ে যে তার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হয়েছে এবং কতো কিছু তার কাছ থেকে শিখেছি তার কোন হিসেব নেই। জ্ঞানচর্চা ছাড়াও তিনি ছিলেন এক জন সঙ্গীতানুরাগী। বইয়ের পাশাপাশি গানের অসংখ্য রেকর্ড এবং টেপ ছিল তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে। শেষ দিকে ছবি আঁকতেও শুরু করেন। বিশেষ করে সত্তর দশকের শেষদিকে দেশে ফেরার পর এসব ছবি দেখা যায় তাঁর ঘরে। তাঁর প্রথম ছবিটি হলো একটি দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে। ব্যাংককে অবস্থানকালে কিভাবে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন মার্কিন মহিলা ও শি[illegible] সামনেই [illegible]

কারণে। আদালত অবমাননার মামলাটি নাকি হওয়া উচিত ছিল নিম্ন আদালতেই যে আদালতের রায় অমান্য করা হয়েছিল। অবশ্য এর পেছনে প্রচণ্ড সরকারী চাপও কিছুটা কাজ করেছে বলে সবার অনুমান। শত হলেও আইয়ুব-মোনায়েমের এতো প্রিয় উপাচার্যের এই অপমান সরকারের জন্যও কম অবমাননাকর ছিল না। তবে অপমান যা হওয়ার হয়ে গেছে কিন্তু ডঃ মাহমুদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কোন বিরতি ছিল না। তিনি যেন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তি এবং মার্কসবাদী শিক্ষাগুরুতে পরিণত হন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে এটা ছিল প্রচণ্ড মাথাব্যথার কারণ। তারা বিভিন্ন জনের মাধ্যমে তাঁকে নানারকম আকর্ষণীয় প্রস্তাব বা স্কলারশীপ দিয়ে বিদেশে পাঠাতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ছিলেন অনড়। উপাচার্য ডঃ গণীর সাথে একটা ফয়সালা না করে তিনি কোথাও যাবেন না বলে ঠিক করেছেন। এভাবে আরো প্রায় দু'বছর চলে যায়। এরপর একদিন বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে তিনি ঠিকই দেশত্যাগী হলেন। পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই তার চাকরির অফার ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি খুব কাছের একটি দেশ থাইল্যাণ্ডে চলে গেলেন জাতি সংঘের চাকরি নিয়ে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। ঢাকায় থাকলে হয়তো শহীদের খাতায় নাম উঠতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব শিক্ষক শহীদ হয়েছেন তাতে আল বদরদের হাত থেকে ডঃ মাহমুদের রেহাই পাওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিল না। এমনকি মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চিকিৎসক ডাঃ মুর্তুজাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। ডঃ মাহমুদকে যারা নির্মমভাবে লাঞ্ছিত করেছিল তাদের মধ্যে দু'জন ছাত্র, তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রাস মাহবুবুর রহমান খোকা ও সাইদুর রহমান (পাসপাত্তু) ১৯৬৮ এবং '৬৯ সালে আরো নির্মমভাবে নিহত হয়। সাইদুর রহমান '৬৮ সালের অক্টোবর মাসে সলিমুল্লাহ হলে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের আক্রমণে আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা যায় এবং '৬৯ এর কোন এক ভোরে মাহবুবুর রহমানের লাশ পাওয়া যায় রেসকোর্স ময়দানে।

থাইল্যাণ্ডের পরেও ডঃ মাহমুদ আরো কয়েকটি দেশে চাকরি করেন এবং সর্বশেষ ১৯৭৭ সালে লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পুরনো অর্থনীতি বিভাগে তাকে পারশোনাল প্রফেসর হিসাবে চাকরি এবং ক্যাম্পাসে একটি ফ্ল্যাট দেয়া হয়। এ ব্যাপারে যে কিছু বাধা আসেনি তাও নয়। বোধ করি বছর পাঁচ [illegible] এ চাকরিতে [illegible] দিকে বেশ [illegible]

যেতেই স্যার আমাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'হায়াত কেমন আছ? তোমাকে দেখতে এসেছি। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।' স্যার কিন্তু বলেননি রাস্তায় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সোজা এয়ারপোর্ট থেকে এসেছেন এবং বেশ দূরে ছাত্রদের একটি অনুষ্ঠানে যাবেন প্রধান অতিথি হিসেবে। সেখান থেকে ফিরে রাতের ট্রেনে আবার ঢাকায় রওয়ানা হবেন। পরে ছাত্রদের থেকে জানলাম ডঃ মাহমুদ প্লেন থেকে নেমেই প্রথমে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমরা নিশ্চয়ই হায়াতকে চেন, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হায়াত হোসেন। আমাকে আগে একটু ওর বাসায় নিয়ে চলো।" এরপরও যে দু'তিনবার তিনি চট্টগ্রাম এসেছেন প্রথমে আমার কাছে এসেছেন। যেন ষাট দশকের সেই স্মৃতিই তাঁকে টেনে নিয়ে আসতো আমার কাছে। আমিও ঢাকায় গেলে মাঝে মধ্যে তাঁর বাসায় থাকতাম এবং একসাথে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করতাম।

ডঃ মাহমুদ আজ আর নেই। অল্প কথায় তাঁর সম্পর্কে সবকিছু লেখাও সম্ভব নয়। তবে শেষ দিকে তাঁকে নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়। তিনি চীনপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন এটাও ছিল একটা বিতর্কের বিষয়, কারো কারো মতে তিনি ছিলেন একরোখা, মেজাজী এবং ব্যক্তিজীবনে উচ্ছৃঙ্খল। প্রতিভাবান ব্যক্তি বা জিনিয়াসদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা একেবারে বিরল নয়। তাছাড়া অনুভূতিপ্রবণ মানুষ অতি সহজেই আঘাত পায়। যে সুন্দর, শোষণহীন ও স্বাধীন দেশ এবং সমাজ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন এবং যার জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন সেখানে তিনি কি দেখলেন? বর্তমানে শাসনের নামে দেশে যা চলছে তা দেখে যে কোন সুস্থ লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমাদের গোটা সমাজটাই কি অসুস্থ হয়ে পড়েনি? বিএনপি আমলের একেবারে শেষ দিকে দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের মুখে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাগত জানিয়েছেন বলে কারো কারো অভিযোগ। আসলে দীর্ঘদিন লিবিয়ায় থাকার ফলে তিনি হয়তো ভেবেছিলেন কর্নেল গাদ্দাফীর মত একজন যৎ ও দেশপ্রেমিক সামরিক অফিসার ক্ষমতায় এলে দেশের মঙ্গল হতে পারে। দেশে সামরিক শাসন ঠিকই এসেছে কিন্তু তাই বলে তিনি কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করেননি, মন্ত্রী বা উপদেষ্টা হননি। বরং অচিরেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে এবং হতাশায় তিনি মুষড়ে পড়েছেন।

যাই হোক, আজ তিনি সকল বিতর্কে [illegible]